– উপসংহার –

উপসংহার

মোট ছয়টি অধ্যায়ে শক্তিমান কথাশিল্পী অভিজিৎ সেন এর নির্বাচিত রচনার আমরা যথাসাধ্য বিশ্লেষণের চেষ্টা করেছি। এখানে আমাদের উপলব্ধিগুলি খুব সংক্ষেপে উপস্থাপিত করছি।

১। অভিজিৎ সেন বিশ শতকের বাংলা সাহিত্যের এক শক্তিমান কথাশিল্পী। ১৯৪৫ এ তাঁর জন্ম। দেশভাগের পরবর্তী অস্থির পরিস্থিতিতে নিতান্ত অপ্রত্যাশিত ও আকস্মিকভাবে তাঁকে চলে আসতে হয়েছিল পূর্ব পাকিস্তানের বরিশালের বাস্তভিটে ত্যাগ করে। গৃহত্যাগের প্রায় দেড় দশক পর সাক্ষাৎ হয়েছে তার পিতা মাতার সঙ্গে। মেদিনীপুর - পুরুলিয়া - কলকাতা নানা জায়গায় কেটেছে ছাত্রজীবন। স্নাতক স্তরেই নানা অস্থায়ী চাকরিতে যোগদান করেছেন, মাঝখানে কিছুদিন কর্মহীনতার পর ১৯৭৬-২০০৪ পর্যন্ত গৌড় গ্রামীণ ব্যাঙ্কের আধিকারিক হিসাবে স্থায়ী চাকরির শেষে অবসরোত্তর জীবনযাপন করছেন কলকাতায়। এই বয়সেও সৃজনশীল লেখনী, শারদ সংখ্যা মিলিয়ে প্রতি বছর নানা ছোট কাগজে প্রকাশিত হয়ে চলেছে লেখকের গল্প উপন্যাস।

২। সংগ্রামময় জীবনে গ্রাম, শহর, বস্তি - সব এলাকার জনজীবন সম্পর্কে বিপুল অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন লেখক। তাঁর শক্তি তাঁর তীক্ষ্ন বস্তুনিষ্ঠ (Objective) পর্যবেক্ষন ক্ষমতা। সাহিত্যের সংসারে এই বিচিত্র অভিজ্ঞতার জগৎই উঠে এসেছে। একসময় বামপন্থী (নকশালপ্রন্থী) রাজনীতিতে সক্রিয়ভাবে জড়িয়ে ছিলেন, কিন্তু বাম শিবিরে বিচিত্র শাখা-উপশাখার দলাদলিতে কিছুটা ক্লান্ত ও হতাশ হয়েই সক্রিয় রাজনীতি পরিত্যাগ করেছেন। রাজনীতি ছেড়ে এলেও বামপন্থী মতাদর্শে আগাগোড়াই অবিচল এই লেখক। ফলত গ্রামীণ জীবন, গ্রামসমাজের প্রান্তিক মানুষের দহনময় যাপনকথার কুশলী রূপকার হয়ে উঠেছেন তিনি। পশ্চিমবঙ্গের গ্রামজীবনের ধীরলয়ের

বিবর্তন, নানাবিধ সংগ্রাম ও আন্দোলনের উত্তাপে ভেতরে ভেতরে নানা ভাঙচুর এর বাস্তব সহ, প্রান্তিক জীবনের বিচিত্র আচার-কৃত্য-বিশ্বাস ও সংস্কৃতির অনুপুঙ্খগুলিকে তুলে ধরেছেন অভিজিৎ সেন।

৩। নির্দিষ্ট তাত্ত্বিক ও মতাদর্শগত অবস্থানই অভিজিৎ সেন-এর সাহিত্য ভাবনার উৎসভূমিতে সক্রিয়। দেশভাগোত্তর পরিস্থিতিতে পুনর্বাসনের সংগ্রাম, জমির লড়াই, আধিয়ার ও বর্গাচাষির আন্দোলন থেকে শুরু করে নকশাল পট পর্যন্ত, সামগ্রিক দেশকাল-রাজনীতি-সংস্কৃতির পটপ্রেক্ষিতের সঙ্গে অন্বিত করে উপন্যাসের ঘটনাপ্রবাহকে উপস্থাপন অভিজিতের প্রিয় কৌশল। তিনি বিনোদন বিলাশীর রসতৃপ্তির লক্ষ্যে সাহিত্য সৃষ্টি করেন না, একটা দায়বোধ বা কমিটমেন্ট এর জায়গা থেকেই লেখেন। তাঁর সৃজনবিশ্ব তাঁর বিশ্ববীক্ষারই প্রতিফলক।

৪। অভিজিৎ সেন উপনিবেশোত্তর চেতনাবাদী লেখক। আধুনিক বাংলা কথাসাহিত্যের প্রাতিষ্ঠানিক আনুকূল্যধন্য মূলস্রোত যে প্রান্তিক পরিসরকে 'অপর' বা 'other' বলে কেবলই প্রত্যাখ্যান করেছে, সেই প্রত্যাখ্যাত 'অপর' পরিসরকেই সত্তর পরিবর্তী লেখকেরা সাহিত্যে প্রতিস্থাপন করতে চেয়েছেন। অভিজিৎ এঁদেরই সগোত্র। নিম্নবর্গীয় জীবনের স্বরসন্ধানে তিনি ছুটে যান ঘরহারা অস্তিত্বহারা বাদিয়া কিংবা সাঁওতালদের জীবন পরিসরে। তাদের মিথ - বিশ্বাস - কিংবদন্তীকে তাৎপর্যবান করে তোলেন শ্রেণিবিভক্ত সমাজে যাপনের দর্পনে। 'রহু চন্ডালের হাড়' উপন্যাসটি পড়লে লাতিন আমেরিকার সাহিত্যে মার্কেজ প্রমুখ লেখকদের অনুরূপ জাদুবাস্তবতার অদ্ভুত প্রয়োগকৌশল পাঠকের দৃষ্টিতে পড়ে।

৫। এলেগরি বা রূপক সৃষ্টি, বাস্তবের সমান্তরাল আরেক বাস্তবকে তুলে ধরা পোস্ট কলোনিয়াল রাইটিং এর অন্যতম বৈশিষ্ট্য। 'রহু চণ্ডালের হাড়' এ দনু - পীতেম-লুবিনি - শারিবা পর্যন্ত প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে চলা ইতিহাসের বিনির্মানে আধিপত্য বা hegemony-র সাংস্কৃতিক নির্মাণ প্রক্রিয়াই বিধৃত হয় আখ্যানের পরাবয়ন

এ (Metatexture) এ । রহুর হাড়ের মিথিক্যাল আখ্যানে 'মিথ' উপায় বা অবলম্বন মাত্র, আসল হল যুগে যুগে প্রভুশক্তির আক্রমণ আর প্রান্তিক মানুষের প্রতিরোধের নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রামকথা। এই উপন্যাসটি উপনিবেশোত্তরবাদী লেখার বঙ্গীয় ঘরানার এক মাইলফলক হিসেবে চিহ্নায়িত হতে পারে।

৬। সত্তর পরবর্তী বাংলা কথাসাহিত্যে লোকসংস্কৃতি-মিথ-পুরাণ-উপকথা-পুরাকথার এক নতুন ধরনের বিনির্মাণপন্থী প্রয়োগ চোখে পড়ে। তথাকথিত আধুনিক সাহিত্যের মধ্যবিত্ত উচ্চবিত্ত কেন্দ্রিক ঘেরাটোপের বাইরে বেরিয়ে গ্রামভিত্তিক, গোষ্ঠী ভিত্তিক আখ্যান রচনার যে প্রয়াস বিশ-শতকের শেষের তিন দশকের কিছু লেখকদের মধ্যে দেখা গিয়েছিল তাদের মধ্যে একজন অন্যতম কথাকার হলেন অভিজিৎ সেন। তাঁদের এই প্রয়াসকে যদি আমরা 'বিকল্প আধুনিকতা'র আখ্যায় আখ্যায়িত করি, তবে এর সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত থাকতে দেখি প্রত্নকথা-লোককথা-মিথ-কিংবদন্তী-লোকবিশ্বাসের এক অচ্ছেদ্য গ্রন্থিকে। আধুনিকতার এই নতুন ধরনের প্রস্তাবনার কথা লেখক অভিজিৎ নিজেও উল্লেখ করেছেন তাঁর বিভিন্ন বয়ানে। লোকজীবনের আচার, ব্যবহার, সংস্কার– এগুলির পুনঃপাঠ এবং সামাজিক তাৎপর্যের সন্ধান আধুনিক আখ্যান লেখকের 'জরুরী দায়' বলে মনে করেন কথাকার।

প্রত্নকথার দারুণ বির্নিমাণ লক্ষ করা যায় অভিজিতের বেশ কয়েকটি লেখায়। 'বিদ্যাধরী ও বিবাগী লখিন্দর' উপন্যাসে ভারতবর্ষীয় মিথ, পুরাণ, মঙ্গলকাব্য, লোককথার উপাদান, অলৌকিক বাস্তবতা এসবের মধ্যে এক নতুন চিন্তা ও চেতনার সন্ধান করতে চেয়েছেন লেখক অভিজিৎ সেন। কৌম সমাজের অস্থির সাম্প্রতিককে যেহেতু ঘিরে থাকে পুরুষাণুক্রমে সঞ্চিত রহস্যময় প্রত্নস্মৃতি সেই হেতু বর্তমানকেও গভীরভাবে নিয়ন্ত্রণ করে অতীত। তাই বিশ শতকের ৯০ এর দশকে (১৯৯৫) লেখা একটি উপন্যাসের শিরোনামে উঠে আসে মনসামঙ্গলের অন্যতম প্রধান চরিত্র 'লখিন্দর' এর নাম। মনসামঙ্গলের লক্ষীন্দর-এর স্ত্রী বেহুলা। যে বেহুলার সতীত্বের

কাহিনি সর্বজনবিদিত। আর অভিজিতের বালা ভালোবেসেছে- বিদ্যাধরীকে। যে বিদ্যাধরী ট্রাক ড্রাইভারদের হাতে লুণ্ঠিতা, ধর্ষিতা। পরবর্তীতে বৃদ্ধ গুণমানের কাছে আশ্রিতা। এই বিদ্যাধরীর চরিত্র সম্পর্কে গুঞ্জন শোনা যায় সমাজের সর্বত্র। তাই মায়নো তার বালার পাশে কিছুতেই কল্পনা করতে পারে না বিদ্যাধরীকে। মানতে পারে না রাজকিশোর, মানতে পারেন না সমাজের বিদ্বজ্জনেরাও। বিদ্যাধরীর পরিচায়নপর্বেই নারীকে 'অপর' হিসেবে নির্মাণের সামাজিক-রাজনৈতিক প্রক্রিয়াকেই অনাবৃত করেছেন লেখক। মেইনস্ট্রিম সাহিত্যে ধর্ষিতার পরিসর নেই, একথা বলা ধৃষ্টতা হবে। তবে এতখানি সহমর্মিতার সঙ্গে তাকে কেন্দ্রীয় চরিত্র করে তোলার মধ্যেই অভিজিতের অনন্যতা। ধর্ষিতা নারীকে মেইনস্ট্রিম সাহিত্য নিয়ে যায় আদালতে, থাকে রিরংসা জাগানো বয়ান, কেন না এই সস্তা পথই পাঠকচিত্ত জয়ের পন্থা। অভিজিৎ এই আধুনিকতার ভড়ংকে প্রত্যাখ্যান করেন, গড়ে তুলতে চান এক বিকল্প আধুনিকতা। তাঁর উপন্যাসে জয়ী হয় মানুষ, মানুষের মানবিক অনুভূতি।

৭। 'বিদ্যাধরী ও বিবাগী লখিন্দর' একটি নতুন ধরনের প্রেমের আখ্যান। এই উপন্যাসে আগাগোড়া স্মৃতি, বর্তমান, প্রত্নস্মৃতি, সামাজিক ও অর্থনৈতিক বাস্তবতা, প্রত্নকথা, কিংবদন্তী, পৌর সংগঠন পরস্পর মিলে মিশে আছে। গ্রামীণ সমাজের কুহকী বাস্তবতায় প্রত্নকথা ও কিংবদন্তীর জোরালো উপস্থিতি এই উপন্যাসের একটি প্রধান বিষয়। তবে কবিরাজ ও বিদ্যার সম্পর্ক, বিদ্যার অতীত, বিদ্যা-বালার সম্পর্ক– এই বিষয়গুলির জটিলতা উপন্যাসটিকে শুধু প্রত্নকথার নামান্তর মাত্র হয়ে উঠতে দেয়নি। এই সম্পর্কগুলির বিশ্লেষণে লেখক যেন এক গভীর মনস্তত্ত্ববিদের ভূমিকা নিয়েছেন। কবিরাজের কাছে বিদ্যাধরী আশ্রিতা। কবিরাজ তাকে আশ্রয় দিয়েছে ঠিকই, কিন্তু স্ত্রীর সম্মান দেয়নি। অজুহাত হলো 'তার কপালে স্ত্রীসুখ নেই'। কিন্তু এই বিদ্যার উত্তাল যৌবনে জ্ঞান হারিয়ে কন্যাসম বিদ্যাকে ভোগ করতেও পিছপা হয়নি। পুরুষতন্ত্রের উৎপীড়নের এক চেহারা মনসামঙ্গলের কাহিনিতে, আরেক চেহারা বর্তমান উপন্যাসে।

পুরাকালের লক্ষীন্দরকে রক্ষা করেছিল যে বেহুলা, তাকে বারবার সতীত্বের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হয়েছে। পুরুষের এবং প্রতাপের আপসহীন ঔদ্ধত্যের পরিণাম কিন্তু ভোগ করতে হয়েছে তাকেই। কিন্তু সে ভেঙে পড়েনি। দায়িত্বশীল নারীই কেবল রক্ষা করতে পারে মুমূর্ষ, রোগগ্রস্ত সমাজকে। 'অন্তর্জলী যাত্রা'য় নারী যশোবতীই মুমূর্ষু সভ্যতার প্রতীক সীতারামকে জীবনের স্বাদ দিতে চেয়েছিল। অন্যদিকে বিদ্যা যে দিব্য পুরুষকে আঁকড়ে ধরে বাঁচতে চায়, সে লখাই মুমূর্ষ নয়, বরং বলিষ্ঠ জীবনবাদের প্রতিভু। তাই সে পারে সামাজিক সাংস্কৃতিক আধিপত্যবাদের যুগযুগান্তরের পাপস্খালনের প্রতিজ্ঞা নিতে। 'আগ্‌লা জন্মের দেনা শোধ' এর উচ্চারণ মনসামঙ্গলের প্রতিতুলনায় এক বিকল্প প্রত্যয়ের, মিনিং বদলের এক নতুন অভিমুখেরই বাঙ্ময় অভিব্যক্তি যেন। এখানেই মিথ এর পুনর্ণির্মানের প্রক্রিয়ায় উপনিবেশোত্তরবাদী অঙ্গীকার ঘোষিত হয়, আক্রান্তজনের পাশে দাঁড়ানোর উচ্চারণে লেখকসত্তা আর নায়কসত্তা যেন একাকার হয়ে যায়।

৮। বাংলা উপন্যাসের যথার্থ মুক্তির উদ্দেশ্যে লেখক সন্ধান করেন নতুন পথের, কথা বয়নের নতুন রীতির। লোককথা-মিথ-কিংবদন্তী-মঙ্গলকাব্য ইত্যাদির মধ্যে দেশজ আখ্যান বয়নের যে পরম্পরা– সেই পরম্পরাকেই বরণ করে নেন তিনি। লেখক নিজেই বলেছেন –

"আমি লোককথার আখ্যানও উপন্যাসে নানাভাবে বিন্যস্ত করি। আখ্যানের অংশ, আখ্যানের চরিত্র, গান, ছড়া, মঙ্গলকাব্য– তার রহস্যময় বাস্তবতা, যা আমাদের প্রাকৃত মানুষের চরিত্রকে ধরতে, বুঝতে ভীষণভাবে সাহায্য করে, এসবও আমি উপন্যাসে আনি।''

এই বিষয়গুলিকে আধুনিক উপন্যাসের উপাদান হিসেবে গ্রহণ করার মূল কারণই হচ্ছে এর মধ্যে লুকিয়ে থাকা এক অব্যক্ত ইতিহাস যার উন্মোচন একমাত্র বিনির্মাণের মধ্য দিয়েই সম্ভব। রহুর অনুগামীদের তাদের প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত

করতে শোষকেরা কেবল খড়্গের জোরই লাগায়নি, লাগিয়েছে বুদ্ধির জোরও। বাজিকরদের পূর্বইতিহাসে বর্ণিত রয়েছে কীভাবে পুরা ও পালি, যারা বাজিকর সম্প্রদায়ের পূর্বসূরী তারা তাদের ভাই-বোন হওয়ার সম্ভাবনাকে গুরুত্ব না দিয়ে প্রেমের বন্ধনে লিপ্ত হয়ে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হয়েছিল, এই ইতিহাসকে পাপের ইতিহাস প্রমাণ করে বাজিকরদের অন্তরে আত্মগ্লানির উন্মেষ ঘটিয়ে তাদের 'নিষিদ্ধ' প্রমাণ করেছিল এই শোষক দল। পবিত্র নদীর অধিকার থেকে বাজিকরদের বঞ্চিত করে, তারা মন্দির স্থাপন করেছিল। এই মন্দির স্থাপন একটি রূপক। যার মধ্যে দিয়ে দেখানো হয়েছে, কীভাবে প্রতিষ্ঠান ব্রাত্য প্রমাণ করে সরিয়ে দিচ্ছে একটি জাতিকে তার আপন অধিকারের জায়গা থেকে।

৯। কেবল প্রত্নকথাকে পুনঃসৃজন নয়, ইতিহাসের মধ্যে এক নতুন ইতিহাসের সন্ধানের প্রয়াসীও হয়েছেন লেখক অভিজিৎ সেন। তাঁর 'রাজপাট - ধর্মপাট' উপন্যাসে চৈতন্যদেবের বিনির্মাণ এই প্রয়াসেরই একটি উদাহরণ। চৈতন্যদেবের পরিচয় যে কেবল ধর্মগুরু বা বৈষ্ণব ধর্মপ্রচারক মাত্র নয় বরং তার সমাজচিন্তা রাজনীতিজ্ঞান যে কতটা বাস্তবসম্মত ছিল, তা লেখক যেভাবে দেখাতে উদ্যোগী হয়েছেন তা সম্ভবত এর আগে আর কোন লেখকই করেন নি। সমাজনেতা হিসাবে চৈতন্যকে বির্নিমাণ করেছেন লেখক। আমাদের সাংস্কৃতিক ইতিহাসের এই নতুন, বস্তুবাদী বিনির্মাণ চৈতন্যকে কৃষ্ণনাম শুনেই উন্মাদ হয়ে ওঠা এক স্নায়ুদুর্বল মহাপুরুষের পরিচিতির সীমানা থেকে বের করে আনে। অভিজিৎ যা করেছেন, অ্যাকাডেমিক গবেষণায় তাই প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন বিখ্যাত অধ্যাপক রমাকান্ত চক্রবর্তী তাঁর 'বঙ্গের বৈষ্ণব ধর্ম' গ্রন্থে। অভিজিৎ দেখাচ্ছেন, চৈতন্য আকস্মিকভাবে অহংকারী অধ্যাপক থেকে সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীতে রূপান্তরিত হন নি। গয়াশ্রাদ্ধ করতে গিয়ে মাধবেন্দ্রপুরীর সঙ্গে আকস্মিক পরিচয়ে চৈতন্যের রূপান্তর। তার জীবনের এই রূপান্তর নিতান্ত আকস্মিকভাবেই ঘটেছে। জীবনীকাব্যগুলি এই ঘটনাটি খুব সংক্ষেপে দেখিয়েছে। বড়মার গোপালমন্ত্র ধারণ করার

পরই এক লহমায় মানুষটার বদলে যাওয়া – অবতারের দৈবী লীলা হিসেবেই দেখেছেন বৈষ্ণবেরা। ঔপন্যাসিক দেখাচ্ছেন, সময়ের দ্বন্দ্ব সংঘাতগুলিকে গভীরভাবে অনুধাবন করেছিলেন চৈতন্য। প্রচলিত ধর্মের নামে যে আচার সর্বস্বতা, তার বিরুদ্ধে যাওয়ার পথ ও পন্থা নিয়ে ভেবেই তিনি সন্ন্যাস নিয়েছেন। এসবই একটি প্রবল মতাদর্শের বিরুদ্ধে সংগ্রামের রণকৌশল।

"ধর্মেরও বিবর্তন আছে। ধর্মকেও সময়োপযোগী করে নিতে হবে"-- 'রাজপাট-ধর্মপাট' এ চৈতন্যদেবের মুখ থেকে নিঃসৃত এই মন্তব্য আর চৈতন্যদেবকে বিষ্ণুর অবতারমাত্রে সীমায়িত করে রাখতে পারে না, মহাপ্রভু পান একজন চিন্তাশীল, সমাজের নিম্নগামিতার পথ পরিবর্তনে প্রয়াসী, সমাজকে সঠিক পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারা দলনেতার মর্যাদা।

১০। লেখক তার রচনায় লোককথা, গান, মঙ্গলকাব্যের রহস্যময় বাস্তবতা, যা আমাদের প্রাকৃত মানুষকে ধরতে বুঝতে ভীষণভাবে সাহায্য করে, তাকেই নানাভাবে তুলে আনতে চেষ্টা করেন। যার সার্থক প্রমাণ লেখকের 'দেবাংশী' উপন্যাস বা বড়গল্পটি। লোহার গ্রামের সারবান, গ্রামের লোকেদের কাছে বড়ই শ্রদ্ধার পাত্র কারণ সে দেবতার অংশবিশেষ, সে দেবাংশী। লোকের বিশ্বাস যে তার ওপর দেবতা আশ্রয় করেন। এই সময় তার ভর হয়। *"আর যখন ভর হয়, তার কথা দৈববাণী।"* এই অতিপ্রাকৃত শক্তি দেবাংশীকে নির্ভর করেই বাঁচতে চায় শোষিত গোষ্ঠী, হতে চায় সংঘবদ্ধ, গড়ে তুলতে চায় আধিপত্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ। এখানে সারবানকে একটি গোষ্ঠীর জাগরণের কেন্দ্রে স্থাপিত করেছেন লেখক। সম্ভবত আমাদের দেশীয় ঐতিহ্যাশ্রয়ী গোষ্ঠীভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থায়ই তিনি আস্থাশীল। সম্ভবত তিনি মনে করেন তথাকথিত আধুনিকতার ব্যক্তিসর্বস্বতা কাটিয়ে আমাদের যাত্রা করতে হবে দেশজ ঐতিহ্যের দিকে। লৌকিক ও অতিলৌকিক জগতের বেড়াজালকে ভেঙে কৌম সমাজের বিশ্বাস অবিশ্বাসের ভেদরেখাটি মুছে ফেলে রাজনীতি, সমাজনীতির মাত্রাকে সংযুক্ত করে ব্যক্তির উত্তরণ ঘটান লেখক। 'দেবাংশী' গল্পে *"সংস্কারের*

নির্মোক খসে ধ্বস্ত সমাজে মানবিকতার মূর্ত প্রতীক হয়ে ওঠে সারবান।'' আর এভাবেই লাতিন আমেরিকার লেখকদের সাথে আমাদের বাংলাসাহিত্যের বর্তমান সময়ের তথাকথিত মূলস্রোত থেকে সরে আসা লেখকের ঐকান্তিকতা ঘটে যায়। লৌকিক এবং অলৌকিক জগৎ একাকার হয়ে গিয়ে একটি নতুন জগৎ নির্মাণ হয়ে যেখানে কোন বিষয়ই আধুনিক উপন্যাসের উপাদান হতে না পারার মত নয়। আধুনিক উপন্যাসের এই ধারায় Magic এবং Reality উভয়েরই অবস্থান রয়েছে কারণ অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত এই উভয় বিষয়ের সংস্পর্শে বাস্তব সমাজের যথার্থ রূপায়ণ, আধুনিক উপন্যাসের যথার্থ চিত্রায়ণ সম্ভব। প্রত্নকথা মিথ পুরাকথার এই বিনির্মাণপন্থী প্রয়োগ অভিজিৎ সেনের Post colonial অবস্থান সুনিশ্চিত করে। অভিজিৎকে এই বিবেচনায়, মার্কেজ, গুন্টার গ্রাস বা চুনিয়া আচেবের সমন্তরালে স্থাপন করা যায়।

১১। অভিজিৎ সেনের 'ছায়ার পাখি', 'অন্ধকারের নদী', 'আঁধার মহিষ' মিলিয়ে যেন রাজনৈতিক সময়ের একটি ধারাবাহিক আখ্যান। উপন্যাস তিনটিতেই ঘটনাপ্রবাহকে অনেকটা নিয়ন্ত্রিত করেছে রাজনৈতিক সমাজের বাস্তব। স্বাধীনতা আন্দোলনে কংগ্রেসের বামপন্থী গোষ্ঠী রাশিয়ার ভিন্ন রকমের রাষ্ট্র প্রনালীর আদলে শ্রেণিহীন, শোষণমুক্ত সমাজ গড়বার স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছিল। মন্বন্তর পেরিয়ে, তেভাগার লড়াইতে কৃষকদের স্বতঃস্ফুর্ত অংশগ্রহণ দেখে স্বপ্নের বাস্তবায়ন সম্ভব এই প্রত্যাশাও জেগেছিল। এই প্রত্যাশায়ই 'ছায়ার পাখি'র গোপাল মজুমদারের মত নিম্ন মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে 'পেশাদার বিপ্লবী' জীবন বরণ করে, পার্টির সর্বক্ষণের কর্মী হয়। বি.টি রণদিভের লাইন কমিউনিস্ট পার্টিকে সাময়িক অপ্রিয় করে তুললেও উদ্বাস্তু পুনর্বাসন, খাদ্য আন্দোলন, বর্গারেকর্ডের দাবিতে আন্দোলন ইত্যাদি বামপন্থী শিবিরে নতুন নতুন মানুষকে নিয়ে এসেছিল। এই গণসামর্থ্যের ভিত্তি কিন্তু সর্বদাই মতাদর্শগত দৃঢ়তা ও গভীরতা ছিল না। বরং ছিল একটা উদার বিশ্বদৃষ্টি, সমতা, গরিবের ভালো হওয়া ইত্যাদি ধারণা সম্পর্কে খানিকটা স্পর্শকাতরতা। মতাদর্শের শিক্ষা কমিউনিস্ট দের দৃঢ়

করে। এই ক্ষেত্রটি নড়বড়ে হলেই পদে পদে আপস হয়, পা ফসকানোর প্রচুর সম্ভাবনা থাকে। কার্যত তাই হয়েছে। 'ছায়ার পাখি'র গোপাল মজুমদার এরা নতুন কমরেডদের কাছে আমল পায় না। সত্তর - আশির দশকে পশ্চিমবঙ্গের মধ্যবিত্ত পরিসরে বামপন্থা তো প্রায় স্ট্যাটাস সিম্বলে পর্যবসিত হয়েছিল। একটু চাপ পড়লেই গর্ভে জমে থাকা লোভ ও স্বার্থ অনাবৃত হয়ে পড়ে শখের পার্টিনেতা আর কর্মীদের। ঘটনা এই যে এসব শখের নেতারা গোপাল মজুমদারের মতো আর্দশবাদীদের শুধু এককোণে ঠেলে দেয় নি, নির্বাচনী রাজনীতির পার্টিগণিতের কাছে তাদের সংবেদনশীলতাও অবান্তর বিবেচিত হয়। তাই নরেন মালোর মতো সৎ কর্মীর নৃশংস খুনের প্রতিক্রিয়ায় বেদনা কম, পার্টির কতটা ক্ষতি হল প্রান্তিক বর্গের এক শিক্ষিত কমরেডের মৃত্যুতে, তার বিশ্লেষণ কম, বরং নেতাদের তাড়া করে নরেনের অবর্তমানে আগামী নির্বাচনে আসন ধরে রাখার অঙ্ক। নিষ্ঠাহীন এই রাজনীতির অন্তঃসারশূন্যতাকে অনাবৃত করে অভিজিৎ সেনের বয়ান। অভিজিৎ এও দেখাতে ভোলেন না, কংগ্রেস দলের মধ্যে বিমলের মর্যাদা আর ক্ষমতা বেড়ে যায় সে খুনের অভিযোগে আভিযুক্ত হবার পর। বস্তুত কম বেশি সকল বুর্জোয়া দলেই, আজকের ভারতবর্ষে একই অবস্থা। হিন্দি বলয়ে 'বাহুবলী'দের যে প্রতাপ, তা হালের পশ্চিমবাংলায়ও লক্ষ করা যাচ্ছে। একদিকে গোপাল মজুমদারের মতো মানবদরদী, সত্যিকারের রাজনৈতিক কর্মী, অন্যদিকে নিখিলেশ্বর - বশিষ্ট - বিমলদের দলের চিন্তা ও কর্ম - রাজনৈতিক সময়ের/সমাজের এই দুই মুখ। প্রথমটি প্রত্যাখ্যাত, দ্বিতীয় গোত্রের প্রাবল্য। ফলে বাম - ডান যে কোনো শাসনেই, সরকার - প্রশাসন - পার্টিসমষ্ঠিতে এক বিশাল মধ্যস্বত্বভোগী শ্রেণি তৈরি হয়েছে, যাদের ভারতবর্ষের রাজনৈতিক সংস্কৃতির 'বাই প্রোডাক্ট' বলা চলে। এদের চাপে যতীন উন্মাদ হয়, আড়বেঁকির প্রান্তিক মানুষ যে তিমিরে, সেই তিমিরেই থাকে।

১২। এই রাজনৈতিক বাস্তবের চিহ্নমালা 'অন্ধকারের নদী'। পঞ্চায়েত এর মাধ্যমে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ এবং তৃণমূল স্তরে রাষ্ট্রীয় উন্নয়নে সাধারণ মানুষের অংশ গ্রহণ

ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় অনেকটাই সার্থক হয়েছে পশ্চিমবঙ্গে, রাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রতিবেদনে এই বাস্তব স্বীকৃত। আবার গ্রামীণ রাজনীতি মানুষকে নতুন করে অসৎ ও বানিয়ে তুলছে। ক্ষমতার স্বাদ পেয়ে, ক্ষমতাকে ধরে রাখতে যত ধরনের অনাচার সম্ভব - ডান বাম নির্বিশেষে সকলেই করে থাকে। কোনো সৎ অফিসার যদি যথার্থ পথে গ্রামোন্নয়নের বরাদ্দকৃত অর্থ খরচ করতে চায়, অন্যায় আর পুকুরচুরি রুখতে চায়, তবে তাকে বাধ্যতামূলক ছুটিতে যেতে হয়। সত্তর দশকের শিক্ষাকে ব্যঙ্গ করে পরবর্তী দশকগুলির রাজনীতি। গান্ধী-নেহেরু কিংবা মার্কস-লেনিন- হরেকৃষ্ণ কোঙার দেয়ালে ঝোলানো ছবি হয়ে থাকেন কেবল, চেতনার গভীরে তাঁদের জীবন ও কর্ম নতুনকালের রাজনীতির কাছে আর কোনো তাৎপর্যই নিয়ে আসে না।

১৩। একে মনসা, তায় ধুনোর গন্ধ হয়ে আত্মস্বার্থচরিতার্থকরণ, স্বজনপোষণ আর আত্মসাতের ক্ষমতার রাজনীতিতে নতুন পালক হিসেবে যুক্ত হয় - সাম্প্রদায়িকতা। হটপূজার হুজুগে ভেসে যায় গণতান্ত্রিক, যুক্তিবাদী মনও। 'আঁধার মহিষ' উপন্যাসে দেখি, বামপন্থীদের মনেও কোথাও বপন হয় সাম্প্রদায়িকতার বিষবীজানু। ধর্মাচারের ব্যবধানকে ক্ষমতা রাজনীতির লাভালাভের হিসাবে জ্ঞানত অথবা অসাবধানে ব্যবহার করেন সকল পক্ষই। 'ভাবের ঘরে চুরি'র এই বাস্তবতাই ছোট ছোট অনুপুঙ্খের সজ্জায় বা detailing -এ উন্মোচিত করেন লেখক। সচেতন লেখক তিনটি উপন্যাসের ইনার সারফেসে রেখে দেন নিজের সমালোচনা। উপন্যাসের নামগুলি ক্ষয়িষ্ণু, হতাশকর রাজনৈতিক সময়েরই ইশারা যেন। পাখির সামনে আর উপরে যে দিগন্তবিস্তারী আকাশ, তাতেও যেন হতাশার ছায়া। যে আলোর সন্ধানে গোপাল মজুমদারের মতো স্বপ্নদেখা পাখিরা 'এখনি, অন্ধ, বন্ধ করো না পাখা' বলে বেরিয়ে থাকে, পথ পরিক্রমার শেষে আর থাকে না সে উৎসাহ, কেননা আলো নেই, আছে শুধু ছায়া অথবা স্বপ্নের গন্ধ ডানায় মেখে যে দেশানুরাগী প্রজন্ম আলোর খোঁজে 'অজাগর গরজে' উচ্ছ্বল জনসাগরে নেমেছিল, আজ সবাই ডানা গুটিয়ে নিরাপদ ছায়ায়, শান্তির আশ্রয়ে। এ

যেন ‘retreat’ এর পশ্চাদপসারণের গল্প। এই ছায়াই নিবিড় অন্ধকারে ঢেকে দেয় সংগ্রামী– সৎ গ্রাম্যসমাজকে। ক্ষমতার রাজনীতি সৎ মানুষকেও পাঁকে মাখামাখি করে। জনতার জাগ্রত চেতনা, শ্রেণিহীন ব্যবস্থার স্বপ্নকথা এক অন্ধকারের নদীতে হারিয়ে যায়। এই তমিস্রার সঙ্গে বিকল চিন্তায় রূপক হয়ে আসে মহিষ এর ছবি (আঁধার মহিষ)। মহিষ এক বোধবুদ্ধিহীন অলস প্রাণী, ঘোলা জলে চিন্তাহীন ডুবে থাকাই তার প্রধান কাজ। মহিষের মতো বোধবুদ্ধিহীন স্থানু হয়ে পড়ে সজীব মন, সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধির প্রবল প্রচারে। আখ্যানের নামগুলিই রাজনৈতিক সময়ের এক প্রতিবাদী সন্দর্ভের ইশারা। এই অর্থেই, আলোচ্য তিনটি উপন্যাসকে রাজনৈতিক সময়ের এক বৃত্তহীন প্রতিবেদনের তিনটি অধ্যায় হিসেবে বিবেচনা করা চলে। তিনটি উপন্যাস মিলেই অভিজিৎ এর ‘রাজনৈতিক সময়ের আখ্যান’ নির্মিতি।

১৪। অভিজিৎ সেনের সমস্ত রচনাই মোটামুটিভাবে সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত। একদিকে বর্গা ব্যবস্থা, ভূমি সংস্কার, অন্যদিকে বর্গাকে কেন্দ্র করে নতুন আধিপত্যের বিকাশ আবার অন্যদিকে কৃষি ক্ষেত্রে নানান এন.জি.ওর অনুপ্রবেশ, কৃষি জমির ভাগ তথা মালিকানার নতুন কাঠামো গঠন - এ সবই লেখকের রচনায় নানাভাবে স্থান পেয়েছে। তার প্রায় সবগুলি উপন্যাসেরই বয়ানে রয়েছে প্রতাপের শোষণের বিরুদ্ধে ঔপন্যাসিকের প্রত্যক্ষ প্রতিবাদ। এই প্রতিবাদের বয়ান কখনো প্রত্যক্ষ, আবার কখনো পরোক্ষ। যেহেতু লেখকের জীবনের বেশীর ভাগ সময়ই গ্রাম ও উপনগরে যাপিত হয়েছে ফলে গ্রামের কৃষকদের জীবনচর্যার নানা বৈচিত্রময় দিক, তাদের নানবিধ বাস্তব সমস্যাও তিনি খুব কাছ থেকে লক্ষ্য করার সুযোগ পেয়েছেন এবং একজন দায়িত্বশীল কথাকার হিসেবে বিষয়গুলিকে সাহিত্যের উপাদান করে তুলে আনার চেষ্টাও করেছেন।

পশ্চিমবঙ্গের জমিদারি উচ্ছেদের মধ্যে দিয়ে আধিয়ার বা ভাগচাষিদের নামে জমির বর্গা রেকর্ড করানোর পর্বে নামে বেনামে কৃষকদের তাদের পাপ্য অধিকার থেকে

বঞ্চিত করে জমি গ্রাসের যে বিচিত্র কৌশল করেছিল জোতদার বাহিনী, 'বর্গক্ষেত্র' উপন্যাসটি তারই ঐতিহাসিক প্রতিবেদন যেন। জমিদারের মিঠে কথার কৌশলে একদিন যে আস্তিক নিজেকে 'বাবুর চাকর' বলে ঘোষণা করেছিল, অভিজ্ঞতার চাপে উত্তর প্রজন্মের পরশুরাম ঘোষণা করে জমির দখল যে কাউকে দেবে না। পঞ্চায়েত আইনের যথার্থতা নিয়ে প্রান্তিক পরিসর থেকে পরশুরাম যে প্রশ্ন তোলে, সেই প্রশ্ন আসলে লেখকেরও ।এভাবেই লেখক কৃষকের জীবনের শরিক হয়ে সমালোচনা করেন কৃষকবিরোধী রাষ্ট্র ও শ্রেণির।

১৫। 'হলুদ রঙের সূর্য' এবং 'মেঘের নদী' উপন্যাসদুটিতেও পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক বাস্তবের প্রেক্ষাপটে কৃষকের জীবন সংগ্রামের কথাই উঠে এসেছে। এসব লেখায় অভিজিৎ সেন তাঁর নিজের অবস্থান থেকেই প্রতিষ্ঠানের সমালোচনা করেন, প্রান্তিক কৃষকের লড়াইর সমর্থনে দাঁড়ান। 'হলুদ রঙের সূর্য' উপন্যাসে লেখক উদ্বাস্তু কৃষকদের যে কঠোর সংগ্রামের কথা বলেছেন, সেই সংগ্রাম কেবল একটি বাড়ি, উদ্বাস্তুর নতুন ঠিকানা সন্ধান কিংবা দুবেলার অন্ন সংস্থানের সংগ্রাম নয়– বরং এর মধ্য দিয়ে তারা নিজেদের অস্তিত্বকেই নতুন ভাবে দাঁড় করাতে চায় – এই অস্তিত্ব রাজনৈতিক প্রক্রিয়াতে প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। তাদের নির্দিষ্ট কোনো স্থান নেই। পূর্ব পাকিস্তানে বা বাংলাদেশে তারা হিন্দু - এই অপরাধে আক্রান্ত হয়, – আবার ভারতবর্ষের মতো অখণ্ড দেশের মানুষ হওয়া সত্ত্বেও নিজের দেশেই চিহ্নিত হয় 'উদ্বাস্তু' নামে। নানা ঘটনার মধ্যে দিয়ে কৃষক শ্রেণি তার শত্রু মিত্র চিনে নিতে পারে, এবং নিজেরাই অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামে নামে - এই মৌলিক কাঠামোর উপর স্থাপন করেন লেখক উপন্যাসের ঘটনাপ্রবাহকে।

১৬। অভিজিৎ কেবল কাহিনিই বলেন না, বরং কাহিনির অন্তর্বয়নে দেশ - কালের যথার্থ বাস্তবতাকেই প্রতিবিম্বিত করেন। লেখক তাঁর রচনায় সময়ের অন্তর্বৃত বাস্তবতার সকল মাত্রাকেই অনাবৃত করার চেষ্টা করেন। অত্যন্ত সময় সচেতন লেখক তিনি। তাঁর

রচনার উপজীব্য বিষয় হল মানুষের দ্বারা মানুষের শোষণ। এই উপন্যাসগুলিতে পশ্চিমবঙ্গের প্রেক্ষাপটে স্বাধীন দেশে ভারতীয় কৃষকের বাস্তব অবস্থা ফুটে উঠেছে। অভিজিৎ সেন এই অবদমিত, অক্লান্ত শ্রেণির মুক্তি প্রত্যাশী। সে মুক্তি রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, মানুষের পরিচয় অর্জনের অভীপ্সার সঙ্গে যুক্ত। অন্যান্য লেখায় ও তাঁর গল্পের ভুবনেও অভিজিৎ এদের কথাই লেখেন। ব্যক্তিগত নির্মিতি নেই তাঁর লেখার ভুবনে, কৃষককে সব পেয়েছির দেশে পৌঁছে দেন না, বরং রাষ্ট্রে সমাজে রাজনৈতিক চিন্তায় উন্নয়ন কর্মসূচিতে কেবলই যে ভূমিলগ্ন কৃষককে নিরাকৃত করবার আয়োজন, তাকেই লেখক অনাবৃত করেন।

১৭। পাঠক হিসেবে অভিজিৎ সেনের উপন্যাসই কেবল নয়, তাঁর ছোটগল্পগুলোও আমাদের বিশেষভাবে আকর্ষণ করে। ব্যক্তিগত পছন্দের দিক থেকে লেখকেরও সম্ভবত তাঁর গল্পগুলোর প্রতিই ঝোঁক বেশি। অভিজিৎ সেনের গল্পের বিষয় বৈচিত্র্য বিস্ময়কর। তবে তাঁর অধিকাংশ গল্পের কুশীলব অন্তেবাসী মানুষ। সাবলটার্ন চৈতন্যের আনুগত্য-প্রত্যাখ্যানের যুগপত্তা চমৎকার অভিব্যক্তি পেয়েছে তাঁর ছোটগল্পের পরিসরে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তীকালে মন্বন্তর, তেভাগা, দেশভাগ, দাঙ্গা, উত্তরকালে আমাদের দেশের অর্থনৈতিক সংকট অভিজিৎ সেনের ছোটগল্পের বয়ানে উঠে এসেছে। তাঁর ছোটগল্পের প্রতিবেদনে ধরা পড়েছে নিম্নবর্গের মানুষের প্রান্তিকায়িত জীবন ও যাপনের বাস্তব, উপেক্ষিত ব্যক্তি পরিসর ও পরিবর্তন-প্রয়াসী জনমনের চলচ্ছবি। অভিজিৎ সেনের গল্পে জীবনাভিজ্ঞতা আর দেশকালের সংলাপ এমন এক নৈরাত্মসিদ্ধিতে পৌঁছায় যেখানে গল্প কেবল গল্প হয়েই থাকে না, হয়ে যায় জানার জিনিস, বোঝার জিনিস। ভাষার মোচড়ে গল্প থেকে কাহিনি নির্বাসন একালের গল্পশৈলীর এক অন্যতম বৈশিষ্ট্য। অভিজিৎ সেপথে হাঁটেন না। বরং তাঁর লেখনীর মধ্যে রয়েছে গল্পবলার এক আশ্চর্য আদিম মোহনীয়তা—যা আমাদের গল্প শুনতে বাধ্য করে।

১৮। প্রান্তিকায়িত, শোষিতগোষ্ঠীর বিশ্বাস, ভাবনা, বয়ানই প্রাধান্য পায় তাঁর গল্পের অন্তর্বয়নে –তাই এই বিকল্প বাস্তবতা কখনো কখনো মিশে যায় আধিবাস্তবতার সঙ্গে। কারণ লেখক মনে করেন, *"মধ্যবিত্তমেদুর জগৎ থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিয়ে যেতে হবে ব্রাত্যজনের সেই প্রান্তিকায়িত পরিসরে যেখানে অনায়াসে আধিবাস্তব মিশে যায় বাস্তবে। উচ্চ সংস্কৃতির মান্যতা-প্রাপ্ত আচরণবিধির বিপ্রতীপে রয়েছে যে কালো মহাদেশ, সেখান থেকেই তুলে আনতে হবে ছোটগল্পের রক্তমাংস, অস্থিমজ্জা।''*

ছোটগল্পের এই রক্তমাংস, এই অস্থিমজ্জার সন্ধানে অভিজিৎ সেই 'কালো মহাদেশ' এর যত্রতত্র ঘুরে বেড়িয়েছেন। দেখেছেন এই মহাদেশে উপাদানের কোনো অভাব নেই। কিন্তু এই উপাদানগুলিকে গল্পে রূপদানের ক্ষেত্রে তাঁর কিছু আধারের প্রয়োজন। আর এই আধারই হয়েছে কখনো জাদু বাস্তবতা, কখনো নিরাবরণ সমাজবাস্তব, আবার কখনো যৌনতা। কিন্তু উল্লেখ্য যে এর মাঝে কোনোটিই প্রয়োজনসাপেক্ষ আরোপিত আধারমাত্র নয়। এর প্রত্যেকটিই গল্পে এসেছে অত্যন্ত আমোঘ ও স্বাভাবিকভাবে। তাই হয়তো লেখক পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায় অভিজিৎ সেনের গল্প সম্বন্ধে বলেছেন,

"পাঠক হিসেবে গল্পগুলির মধ্যে যত ঢুকি ততই বুঝি এ আমাদের জীবনের নানা ঋতুর আখ্যান।''

অর্থাৎ লেখকের বহুরৈখিক বিষয়বোধ নানা ঋতুর বৈচিত্র্যময় ছবি আঁকে পাঠকের মনে। বিস্ময়কর ন্যারেশন, কথক ও লেখক সত্তার ঐকান্তিকতা, অদ্ভুত কাহিনির বুনট–অভিজিতের গল্পরাজিকে সমৃদ্ধ করে।

১৯। যৌনতাকে অত্যন্ত নান্দনিক ভাবে অভিজিৎ সেন তাঁর কিছু গল্পে ব্যবহার করেছেন। স্ফিংকস এমনই এক গল্প যা স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখ্য। গ্রীক পুরানের ভয়ংকর দানবী চরিত্র স্ফিংসই গল্পে এসেছে যৌনতার ফ্যান্টাসির আধার হয়ে। ফ্রয়েডীয় মনোবিকলন তত্ত্বের আলোয় ব্যাখ্যায়িত হলে ব্যাপারটা অবচেতনের একটি মানসিক

আকাঙ্খা থেকে জাগ্রত বলে মনে হয়, কিন্তু কোথাও প্রশ্ন রয়ে যায়, আমাতী সমবায় দপ্তরের অর্থলোলুপ কর্মচারি নকুলের আপাত অসুন্দর অথচ প্রবল যৌনাকাঙ্খা জাগানো স্ত্রী বলেই কি তার তুলনা দানবী চরিত্র স্ফিংসের সাথে? এই কারণেই কী তথাকথিত অভিজাত বর্গের প্রতিভূ সুরঞ্জনের 'উচ্চস্তরের' শৈল্পিক চিন্তাচেতনার প্রমাণ শান্তিনিকেতনের ব্যাগটি সুরঞ্জনের স্বপ্নে হয়ে যায় আমাতীর নোংরা ব্রেসিয়ার? এখানে মনে হয় সম্ভবত নিজেকে শিক্ষিত, শিল্পসম্মত মনোভঙ্গির অধিকারী মনে করা মধ্যবিত্তের অবচেতনের যৌন ফ্যান্টাসি তার অন্তরে যে প্রবল দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করে তা একইসাথে এক প্রবল আকর্ষণ ও ভয়ের জন্ম দেয়, তাই আমাতী সুরঞ্জনের কাছে হয়ে ওঠে দানবী চরিত্র স্ফিংস।

কিন্তু আবার অন্যদিকে আমাতীর কাছে সুরঞ্জন কোনো কল্পনা বা ফ্যান্টাসি নয়, সে আমাতীর কাছে সন্তান লাভের একটা মাধ্যম, যাকে সে বহুদিন ধরে পেটকাটি বুড়ির থানে প্রার্থনা ও দোমাসী জোগেনের মন্ত্রপড়ার ক্রিয়ার মধ্য দিয়ে লাভ করতে চেয়েছে। যেহেতু তার স্বামী নকুল শারীরিকভাবে অক্ষম তাই আমাতীর এই বিশ্বাস ও টোটকায় স্বামী নকুলেরও মত রয়েছে। এক সন্তানহীন নারীর সন্তান লাভের এই কামনা সুরঞ্জনকে চেতনার এক এমন স্তরে পৌঁছে দেয়, সেখান থেকে সে স্কিংকসের মতোই একেবারে খাদের অতলে নিক্ষেপিত হয়। আর এভাবেই লেখকও বাস্তব ও কুহকের সমন্বয়ে পাঠককূলকে তলিয়ে দেন ভাবনার এক গভীর অতলে।

যৌনতাকে আধেয় হিসেবে ব্যবহার করে রচিত লেখকের আরেকটি উল্লেখনীয় গল্প হল 'মানব দেহের গৌরব'। এই গল্পটিতে লেখক এমন একটি নারীচরিত্রের নির্মাণ করেছেন যার শরীরের সংস্পর্শে ঘরের চালা দপ করে জ্বলে উঠতে পারে। এই শরীরই মিলনকে গোটা জীবন ধরে তাড়িত করে নিয়ে গেছে। 'মানব দেহের গৌরব' গল্পে দেখি এই দেহ সময়ে সময়ে ভিন্ন ভিন্ন ভূমিকা পালন করে মানুষের জীবনে। মিলনের এই দেহের আকর্ষণেই তার খুড়-শ্বশুড় বাধ্য হয় চানঘরের বেড়ায় চোখ রাখতে, আবার এই

দেহই তাকে বাঁচিয়ে রেখেছে, দিয়েছে মাখনের আশ্রয়, আর এই দেহের জন্যই সে ঘৃণার পাত্র তার মেয়ে সুলেখার কাছে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়-এর 'পুতুল নাচের ইতিকথা'য় শশী কুসুম কে বলেছিল *"শরীর, শরীর, তোমার মন নাই কুসুম?"* শশী চেয়েছিল কুসুমের মনকে খুঁজতে, কেননা তার শিক্ষিত নাগরিক 'রুচিসম্মত' হৃদয় শরীরকে কেবল শরীর হিসেবে গ্রহণ করতে কোথায় যেন বাধাগ্রস্ত হচ্ছিল, এই বাধা মিলনের ক্ষেত্রে কেউই অনুভব করে নি। কারণ প্রান্তিকায়িতের পরিসরে রোমান্টিক ভালোবাসার পরিসর বড়ই কম। তাই এখানে স্বামী গদাই অক্ষয় সা-র টাকা দিতে পারছে না বলে স্ত্রী মিলন কে সঙ্গে নিয়ে যায় কিছুটা অধিক সময় পাওয়ার আশায়। এভাবেই সমস্ত তৈরি করা ধারণার মর্মমূলে আঘাত করে প্রান্তবাসীর জীবনের বীভৎস বাস্তব সমস্যাকে অদ্ভুত নির্লিপ্ততার সঙ্গে গল্পে তুলে ধরেন অভিজিৎ।

২০। দেশভাগ নিয়ে অভিজিৎ সেন এর কয়েকটি গল্প রয়েছে। দেশভাগ একটি ঘটনামাত্র নয়, দেশের রাজনীতি, অর্থনীতি ও সর্বোপরি দেশের মানুষের মনের ওপর এর প্রভাব অত্যন্ত গভীর ও সুদূর প্রসারী। দেশভাগের মর্মান্তিক পরিণতি হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই নিজেদের জীবন দিয়ে অনুভব করেছে। এক বিশাল মানবগোষ্ঠী তাদের ধর্মগত, জাতিগত, জন্মগত সমস্ত পরিচয় ভুলে গিয়ে এক নতুন পরিচিতি লাভ করেছিল 'উদ্বাস্তু' রূপে। দেশছাড়ার শূন্যতা লেখকের অন্তরকে আঘাত করেছিল ভীষণভাবে, তাই এই শূন্যতার আকুতিকে তিনি চমৎকারভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন তাঁর 'হিমঘর' গল্পের বেগম আমেদ চরিত্রটির মধ্যে। দেশভাগের ফলে পূর্ববঙ্গ থেকে পশ্চিমবঙ্গে উঠে আসা এই উদ্বাস্তুদের জীবনসংগ্রাম কেবল একটি বাড়ি, উদ্বাস্তুর নতুন ঠিকানা কিংবা দুবেলার অন্নসংস্থানের সংগ্রাম নয়, বরং এর মধ্যে দিয়ে তারা নিজেদের অস্তিত্বকেই নতুনভাবে দাঁড় করাতে চেয়েছে, যে অস্তিত্ব রাজনৈতিক প্রক্রিয়াতে প্রত্যাখ্যাত হয়েছে।

দেশবিভাগের ফলে একদিকে যেমন আসামে, উত্তরপূর্বাঞ্চলে উদ্বাস্তু আগমনে

বিভিন্ন সমস্যার সৃষ্টি হয়েছিল, তেমনি উত্তরবঙ্গেও জনগোষ্ঠীগত সমস্যা দেখা দিয়েছিল। উত্তর বঙ্গের বেশিরভাগ জমির মালিকই ছিল রাজবংশীরা। সেখানে দেশবিভাগের পরে পূর্ববঙ্গ থেকে আসা হিন্দুরা দিনাজপুর, রংপুর, জলপাইগুড়ি, কুচবিহার ইত্যাদি অঞ্চলে উঠে আসলো। তারপর তারা যখন ধীরে ধীরে দখলদারি অর্জন করলো, বর্গা ব্যবস্থায় কিছু কিছু ভূমির অধিকার সম্বন্ধে উদ্বিগ্ন হল। তাই উত্তরবঙ্গে গড়ে ওঠা কামতাপুরি আন্দোলনের বিভিন্ন কারণের মধ্যে দেশভাগকেও একটা প্রধান কারণ ধরা যেতে পারে।

অভিজিৎ সেনের বেশিরভাগ উপন্যাসই উত্তরবঙ্গ কেন্দ্রিক। তিনি তাঁর এই উপন্যাস গুলিতে দেখাচ্ছেন উত্তরবঙ্গের রাজনীতি, উত্তরবঙ্গের ভূমিমালিকানায় পূর্ববঙ্গ থেকে আগত উদ্বাস্তুরা অনেক পরিবর্তন সাধন করছে। মাটির প্রশ্নে, ভূমির প্রশ্নে, আধিপত্যের প্রশ্নে গড়ে ওঠা দ্বন্দ্বের মূলে সম্ভবত এই দেশভাগ ও উদ্বাস্তু সমস্যাই। যে জাতি গোষ্ঠীগত সঙ্কট তৈরি হয়েছিল উত্তর পূর্বাঞ্চলে,– জনসংখ্যার ভারসাম্য, বিভিন্ন ভাষিক গোষ্ঠীর সংখ্যাগত ভারসাম্য, জমিমালিকানার ভারসাম্য যেভাবে বিপর্যস্ত হয়েছিল প্রব্রজিত মানুষের দ্বারা তা দেশভাগেরই আরেক করুণ ফলশ্রুতি। এ প্রসঙ্গে ‘কাক’ ‘মানুষের পেছন দিক’ ইত্যাদি গল্পও স্বতন্ত্র উল্লেখ দাবি করে।

২১। অভিজিতের গল্পের ভুবনে সমকালীন বাস্তবে বিভিন্ন শ্রেণি ও সম্প্রদায়ের যাপন কথার বিচিত্র পলিফোনি সৃষ্টি হয়েছে। উপন্যাসের মতো গল্পের ভুবনেও তিনি মানুষের স্ববিরোধ, মূলবোধ ও মতাদর্শের সংকট, মধ্যবিত্ত জীবনের ভাবের ঘরে চুরি ইত্যাদি বাস্তবকে উপস্থাপন করেছেন। গল্প থেকে ‘গল্প’ হঠানোর আয়োজনে তিনি নেই, বরং ‘গল্প বলছি, শোনো’– এই তার শৈলী। কথকতার আধুনিক নিরীক্ষাগুলি এড়িয়ে মধ্যযুগীয় কথকতার ঐতিহ্যকেই যেন নবরূপ দান করেন তিনি।

২২। বাংলা আখ্যানসাহিত্যের ধমনীতে নতুন রক্ত সঞ্চার করেছেন সত্তর দশকের যে সব লেখক, অভিজিৎ এঁদেরই অন্যতম। এত বিচিত্র বিষয়ে তিনি লিখেছেন যে,

‘উপসংহার’ এ তাঁর লেখার বৈশিষ্ট্য গুটিয়ে আনা খুব মুশকিল। আমাদের এই বিশ্লেষণী অধ্যয়নে আমরা নতুন করে পরিচিত হয়েছি এক কুশলী কথাসাহিত্যিকের সঙ্গে যিনি আক্ষরিক অর্থেই দায়বদ্ধ। দায়বদ্ধতা তাঁর মানুষের প্রতি। মানুষের জন্য তিনি লেখেন। লেখাই তাঁর রাজনীতি, লেখাই তাঁর যুদ্ধ। এই লেখনযোদ্ধা বৃত্তধর্মী, আদি অন্ত মধ্য সমন্বিত, অতি নির্দিষ্ট উপসংহারে রুদ্ধ কোনো কাহিনি বলেন না, বরং আরিস্ততল নির্দেশিত ‘কাহিনি’ লক্ষন অতিক্রম করে পৌঁছান সমাপ্তিবিহীন আখ্যানে। তাঁর লেখা যেন এক অন্তহীন আখ্যানের নানান এপিসোড মাত্র। আখ্যানের কুশীলব প্রান্তিক মানুষ, এদের যাপনকথার বহুমাত্রিক স্থাপনার অন্তর্বয়নে এই পোস্ট কলোনিয়াল লেখক রেখে দেন তাঁর সমালোচনাভাষ্যও। আধিপত্যবাদী রাষ্ট্র এবং অন্তঃসারহীন আধুনিকতার নামে জীবনবিচ্ছিন্নতাকে তিনি প্রত্যাখ্যান করে গড়ে তোলেন এক বিকল্প নন্দনলোক। এই নন্দনলোকে আমাদের কুণ্ঠিত পরিক্রমারও তাই কোনো উপসংহার নেই, এ আসলে নতুন অভিনিবেশের অঙ্গীকার, পরবর্তী অধ্যয়নের সূচনা মাত্র।

*****